ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া এক কবি-প্রণবেন্দু

হীরক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ শতকের পাঁচের দশকে যেসব কবি তাদের লেখায় নিজস্ব ভাষা খুঁজে পেয়েছেন এবং নিজস্ব পথে দীর্ঘদিন হেঁটেছেন তাদের মধ্যে শঙ্খ ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার এবং প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত উল্লেখযোগ্য।

স্বাধীনতা পরবর্তী দেশকালের পরিস্থিতি, রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার ভাঙনের সূচনাপর্বে টালমাটাল অবস্থা। বাংলা তথা ভারতে 'রাজনীতির আঙিনায় নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেই সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়, প্রশ্নমনস্কতা সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন, সত্তার যন্ত্রণা সম্পর্কিত অনুভূতি প্রবণতা, অভিজ্ঞতার ভিন্নমুখীনতা পঞ্চাশের কবিদের লেখায় বার বার ফুটে উঠেছে।

এই রকমই এক পরিস্থিতিতে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত একটু স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হতে লাগলেন। একদিকে ভয়, বিষাদ এবং ম্লান সাংগীতিক কাব্যরূপ ফুটে উঠছিল তার কলমে অন্যদিকে স্তব্ধ তর্জনীর মতো দাঁড়িয়ে থাকা জীবন গভীর অভিমানের স্বর ছুঁয়ে ভালোবাসা ও প্রতিবাদে একই হাতে যেন খুব আস্তে করে বলে দেওয়া তার বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল ক্রমশ।

যেমন ধরা যাক '...বাড়ির বিষয়ে / আমি খুব কম জানি / বন্ধুরা খুব বড়োলোক নয়, / তারা পায়রার খোপের মতো / সাময়িক রন্ধ্রে বাস করে। / আমাদের দেখা হয় / সমবায় শখের চাতালে / .../ বাড়ির বিষয়ে আমি এত কম জানি / যে-কোনো বৃষ্টি এলে / আমার স্বদেশ ঝরে, টের পাই, / আমি ছত্রহীন কোনো অনিবারণীয় / হাভাতে নেশার ঘোরে / ভিজে সার হই।/ সমস্ত কুকুর ভেজে, বাড়ি ভেজে,/ নক্ষত্র-বিহীন কোনো চতুষ্কোণ নীরবতা ভেঙে,/ আমার শরীর ছেড়ে হৃদয় আদুল হয়ে, / বাদল পোহায়।'

[বাড়ি বিষয়ে □ অংশ □ সদর স্ট্রিটের বারান্দা]

আসলে ঢেউ যখন আসে তখন মূল স্রোতের ধাক্কা তো সহ্য করেন কবি। প্রণবেন্দু ভাষ্যে কোথাও কোনো জ্ঞান দেওয়া নেয়। আছে সহজ সরল বোধ আর আশ্চর্য এক অভিমান।

'... খুব বেশিক্ষণ আমি আলো দিতে শিখিনি এখনও—/ আমার নিজের কিছু

প্রণবেন্দু প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এক ঋতু' প্রকাশিত হয় শতভিষা থেকে ১৯৫৬ সালে। বলাই বাহুল্য বন্ধুবর আলোক সরকার এবং অলোকরঞ্জন খুব যত্ন নিয়ে ছেপেছিলেন এই বইটি। কিন্তু তখন কৃত্তিবাস আন্দোলন অত্যন্ত জোরদার হলে যখন তার সদর স্ট্রিটের বারান্দা কাব্যটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের আগ্রহে কৃত্তিবাস প্রকাশনা থেকে তা অত্যন্ত সাড়া ফেলে দেয় এবং আলোচিত হতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রণবেন্দুর কবিতা জনপ্রিয়তা অর্জন করে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে। তবু কেন কবি লিখেছিলেন : 'একটা কথা জানতে আমায় হবে / ওরা আমায় পাহাড় থেকে / গড়িয়ে ঠেলে দিল কেন? / ... / মরে যেতে যেতেও দেখব, কোনো নদীর জলে এসে / ওদের ছায়া লজ্জা হয়ে কাঁপে কীনা –' [অপেক্ষা □ অংশ □ সদর স্ট্রিটের বারান্দা]

তাহলে কী কোথাও কোনো ঈর্ষাপরায়ণা বা পরশ্রীকাতরতা লক্ষ্য করেছেন কবি। কবিতো বন্ধুত্ব চেয়েছেন, ভালোবাসা চেয়েছেন, হীন ঈর্ষা তো তিনি চাননি। যেমন একবার সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন 'আমি পিঠ ফেরাতেই বন্ধুরা ঢেলেছে বিষ, সেই বিষে আমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে'। এ কিন্তু অন্য কথা।

দল ও মতের আনুগত্য স্বীকার না করে চললে কবিকেও কী কখনো কখনো দলছুট হয়ে যেতে হয়। কয়েকজন মতাবলম্বী কিংবা সমর্থক হয়তো সেটাকে তারিফ করে চলে আর বৃত্ত ক্রমশ ছোটো হয়ে পড়ে। সেই ভয় এবং অন্তঃসার হারানোর আশঙ্কাতেই কী কবিকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় : '... মানুষের পাশ থেকে সরে যায় সঠিক মানুষী, / ভাষা না শেখার জন্য, ভাষা না জানার জন্য,/ শুধু ভাসা ভাসা / চলেছে সকলেই / তবু কেন চলে... / ... / পার্কে ছাতা হেঁটে যায়;/ মানুষ আড়াল করা।'

[এই সেই জায়গা □ অংশ □ শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়]

এই রকম তার গূঢ়, সাংকেতিক এবং মোহসঞ্চারী কবিতাগুলি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে এবং তার ফলস্বরূপ ১৯৭৫ সালে তার লেখালেখির পঁচিশ বছর বাদে আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তার 'নিজস্ব ঘুড়ির প্রতি' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

স্বপ্ন ও সৌন্দর্যে তাপিত এই কবির নিভৃতচারী অথচ সোচ্চার তার ভাষায় খুব কম দেখা গেছে বাংলা সাহিত্যে। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে যা বলার তা হল শব্দ নির্বাচনে, ছন্দ ব্যবহারে, পঙ্‌ক্তি সাজাবার ব্যাপারে কোনো নির্ধারিত নিয়মের বাইরে থেকেছেন, মনে হয় তিনি যেন নিজস্ব এক অকৃত্রিম ধারা সৃষ্টি করতে চান। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ ও স্বভূমি তাকে কী ভোলা যায় : 'এই একটু পুড়ে যাওয়া দেহ / বাঁকা মেরুদণ্ড স্বেদ, মুখ ভরা ফেনা / রেখেছি তোমার পিঠে হে স্বদেশ, হে আমার চিরচেনা দেশ, / তুমি এখন আমাকে নিয়ে যা খুশি করবার তা-ই করো / ইচ্ছে হলে ফেলে দাও নষ্ট শশার মতো মাটির ওপরে / নইলে আমাকে করো লাল জবা, প্রত্যেকের স্মৃতির ভেতরে / যেভাবে দুএকটা ধ্বং দুএকটা ফল ডালপালা / চিরদিন থেকে যায় বমন-বিধুর এই পিছল উঠোনে, / আমি তো পুড়েছি, পুড়ি সলতের মতো পুড়ে যাই— / আমার ভস্মাধারে যেন ভাসে তোমার নদীতে।'

[স্বদেশের কাছে আবেদন □ অংশ □ রৌদ্রের নখরে]

রৌদ্রের নখরে অফবিট প্রকাশনা থেকে ২০০২-এ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটিই তার শেষ কাব্যগ্রন্থ। সাধারণত কবিতায় তত্ত্বভাবনা প্রকাশের জন্য দার্শনিকতার যে ঝোঁক তাতে গুরুগম্ভীর মেজাজ সৃষ্টি হয় কিন্তু প্রণবেন্দুর ক্ষেত্রে তা খাটে না তিনি সহজেই আপ্তকথা বসিয়ে দিতে পারেন। শব্দ অক্ষর বন্ধনীতে জীবনের খুঁটি নাটি দেখার কৌশল বহিরঙ্গ ছাড়িয়ে ক্রমশ অন্তরঙ্গে মিশে যায়। ভাবগত বৈদগ্ধ এবং নির্জনতা, নৈঃশব্দ একসময় ঘাম-রক্ত-অশ্রুতে মিশে যায়। পাঠকও এক নতুন স্বপ্ন ও বাস্তবতার সেতু রচনা করতে পারে অনায়াসেই।

মানুষকে খুব কাছের টানার যে ভঙ্গি তিনি করায়ত্ত করেছিলেন সারাজীবন তাকে লালন করেছেন যেমন : 'এভাবে ঘর তৈরি কোরো না / হাত বাড়াও, মানুষজনকে কাছে আনো / অত জটিল ঘুরিয়েছিলে কেন লাটিম?/ ... / ঘর গড়তে যেও না, পারবে না, / বরং নাও বুকের খুব কাছাকাছি/ যা আসে তাই, চেনা মানুষ,/ অজানা বা / থেকো না নিঃসঙ্গ /'

[বিকল্প □ অংশ □ শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'শুধু বিচ্ছিন্নতা নয়' — এই কাব্য গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় বিশ্ববাণী থেকে ১৯৭৬ সালে। প্রণবেন্দু সবসময় শূন্যের কিনারে বসে কথা খুঁজেছেন অথচ শূন্যতা হাতড়াতে হয়নি তাকে কখনও। তার কবিতা মোহনাতে এসে মিশে

যায় মেঘ ও বৃষ্টিতে স্রোত পায়। ঝরে পড়ে। পবিত্র অহিফেনের মতো। ঐশ্বরিক চুম্বনের মতো। তাই তার কবিতা কখনোই ইস্তাহার হয়নি। ক্ষোভ ও যন্ত্রণাও বলেছেন নম্র উচ্চারণে। এভাবেই এক নতুন ইতিহাস অজান্তেই বাংলা কবিতায় রচিত হয়ে গেছে। '... মুখে খড়কুটো নিয়ে যে এসেছে, তার কাছে / সাইকেল নামিয়ে রেখে যে ছেলে আসছে, তার কাছে / যে ভাঙা-বিনুনি নিয়ে দৌড়ে গেল, আজ তারও কাছে / আমি করজোড়ে বলি : এসো, কাছে এসো, / অন্ধকারে আমরা কেন এখনও একাকী।'

[অন্ধকারে আরও কাছে এসো □ অংশ □ হাওয়া স্পর্শ করো]

'ঈশান থেকে প্রকাশিত হয় 'হাওয়া, স্পর্শ করে।' ১৯৭৭ সালে। বিশেষ কোনো একজন কবিকে সারাজীবন কী ভালো লাগে ! পড়তে পড়তে জানতে জানতে একদিন ফুরিয়ে যায়। ভালো লাগে না পাঠকের সব সময়। যে কবি যতই বিশ্রুত হোন না কেন। কিন্তু প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের ক্ষেত্রে যে বক্তব্য খাটে না। কেননা ফল্গুধারার মতো তার কবিতা উৎসকে প্রতিবাদ সিঞ্চিত করে না। খুব অল্প বয়স থেকেই কিংবা কাব্যজীবনের শুরুতে তিনি যে অন্বেষণ করেছেন, সারাজীবন ধরে শুধু নিজের সঙ্গে নিজে কে অন্বেষণ তিনি বহাল রেখেছেন।

'... শিকড় ফুরিয়ে গেলে, বৃক্ষ আছড়ে পড়ে মাটির ওপরে। / তুষারে, সমস্ত জল হিম হয়ে যায়। / সাইকেল থেকে নেমে, নিঃসঙ্গ যুবক পথ হাঁটে।/ মানুষ যে চেষ্টা করে - / এই কথা / অন্য মানুষ মেনে নেয়?/ কোনোমতে বেঁচে থাকে / এক জায়গায় এসে, সমস্ত মানুষ ভেঙে যায়।'

[মানুষেরা পারে না □ অংশ □ মানুষের দিকে]

আজ থেকে পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ লেখা প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালে করুণা প্রকাশনী থেকে 'মানুষের দিকে' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হওয়া মাত্র খুব হইহই হয় এবং পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কবিতা প্রকরণে অংশত পরীক্ষা নিরীক্ষাতেও যাবার পছন্দ তার ছিল না কখনও। তবু আসল কম্মোটি তিনি অনায়াসে করে দিতে পারেন। সেটাই এখনও বিস্ময় রয়ে গেল। এটাই বোধহয় একবিংশ শতাব্দীতে নতুন কবিদের গবেষণার বিষয়। '... এসো, এসো, এসো তোমরা এসো, / এসে আমার চোখের সামনে দাঁড়াও,/ বুকের ওপর সহজে হাত রাখো, / চড়ুইভাতির রঙিন গল্প বলো।/ ... / এসো, তোমরা অনেকবার শূন্য ভরে এসো, / এ যে আমার জমিতে ঘর বাঁধো।'

এক সময় ভয়ংকর নেতি তাকে উত্যক্ত করে তুলেছিল কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। কবিতায় বিশুদ্ধ কোনো একটি মাত্র রূপকেই শুধু তিনি গড়ে তুলতে চান-নি। সবসময় একমাত্রিকতা থেকে বহুমাত্রিকতা স্পর্শ করেছে স্বচ্ছন্দে। স্বাধীন হয়েছে, মুক্ত হয়েছে কবিতা, সহানুভূতিতে নয় সত্যের ইশারায়। একই সঙ্গে পাঠককে শব্দস্নানের আনন্দ দেয় এবং অবশ্যই তাই ব্যক্তি - বৃত্তি অনুসারে।

'... রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে, তবু মানুষ হেঁটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে, / রাস্তা বন্ধ, তবু মানুষ পথ করে নিচ্ছে অন্যদিকে,/... / হাতে হাত দিয়ে, ঘুরে ঘুরে, নেচে উঠছে মানুষ -/ রাস্তা খোঁড়া হচ্ছে, রাস্তা বন্ধ হচ্ছে, রাস্তা ভেঙে যাচ্ছে তবু।'

[মানুষ জন □ অংশ □ হাওয়া স্পর্শ করো]

আত্ম উন্মোচনের এই যে বিবিধ আয়োজন। 'রাস্তা' শব্দটি বারংবার এসে পড়ছে আছড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে প্রোজ্জ্বল তাই আধুনিক। আর আধুনিক বলেই আত্মময় হৃদয় সিঞ্চিত। এ প্রসঙ্গে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতাংশ মনে পড়ে, '... একটি ছিল দেবার / আর একটি নিজে নেবার / এসো না কাছে আমার আছে / মুঠিতে রাখা বিষ / ভয়ংকর ভয় দেখায় আমার হাতে বিষ / ... / একদা পরমান্ন ছিল শকুন খেয়ে গেছে / চুলের মূলে বকুল ছিল উকুন / খেয়ে গেছে / দু-হাতে ছিল রেখার ভার জোছনার আর মোছনার/ এখন তার বদলে আছে দু-হাত ভরা বিষ / এসো না কাছে আমার আছে মুঠিতে রাখা বিষ / ভয়ংকর ভয় দেখায় / আমার হাতে বিষ / ...'

স্বভূমি এই যে নির্মাণ। ঢেউ এর পর ঢেউ এসে পড়ার মতো শব্দের ফলায় যে প্রজ্ঞা তা কিন্তু কখনোই আলুলায়িত উপস্থাপন হয়ে ধরা পড়েনি। এ রকমই চিন্ময় কৌতূহলে প্রণবেন্দু এগিয়ে গেছেন। প্রকাশিত হয়েছে তার অসাধারণ সব কাব্য অত্যন্ত নম্রভাবে তাকে পাঠক গ্রহণ করেছে। ক. অন্ধপ্রাণ, জাগো (১৯৮৪) □ আনন্দ পাবলিশার্স, খ. নিঃশব্দ শিকড় (১৯৮৬), প্রমা প্রকাশনী, গ. শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৮৭), নাভানা পাবলিকেশন, ঘ. কবিতা সমগ্র (১৯৯০), প্রমা, ঙ. এখন গুজব

নেই (১৯৯১), প্রতিভাস প্রকাশন, চ. বাধা পেরোনোর গান (১৯৯৪), আনন্দধারা, ছ. নির্বাচিত কবিতা (১৯৯৯), কবিতা পাক্ষিক প্রকাশন, জ. রৌদ্রের নখরে (২০০২), অফবিট পাবলিকেশন।

এতদসত্ত্বেও খুব দুঃখের সঙ্গেই বলতে হয় ২০০৩ সালে তিনি রবীন্দ্র পুরষ্কার পান। প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রায় পঞ্চাশ বছর বাদে।

রবীন্দ্রনাথকে বলা হয় রৌদ্রের কবি, তাহলে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে বলা যেতে পারে ভোরের কবি। কিন্তু যে ভোর ভয় নিয়ে আসে। তারই কথায় : 'ভোর হল : এই শুধু খবর এখানে / আর কোনো ইচ্ছে নেই, আর কোনো সাধ, ভালোবাসা / রোদ্দুর ঝিকিয়ে পড়ে শুয়ে আছে বারান্দার ওপারে বাগানে / ভবিতব্যতার দিকে আঙুল দেখায় গাছপালা।'

এই যে কবিতার মুখ এই যে স্মৃতি কাতর অভিব্যক্তি তা বারবার আধুনিক বাংলার পাঠককে হন্ট করেছে তার মননে, চিন্তনে স্বাভাবিক বোধে। জীবনের এক একটি অধ্যায়ের সঙ্গে। জীবন স্রোতে। 'ভবিতব্য' শব্দটির ভেতরে লুকিয়ে আছে সেই বীজ। স্তব্ধ তর্জনীর মতো।

কিছুদিন আগে একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতা নাকি আর লেখা হবে না, লেখা হলেও ছাপা হবে না। পত্রিকাগুলো থেকে কবিতাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। কথাটা সত্যি হোক আর নাই হোক, সে-ই সমালোচনায় না গিয়েও বলা যায় কবিতা থাকবে, তা কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হোক আর নাই হোক। কেউ গ্রহণ করুক আর নাই করুক। এমনকি যতরকমের অবজ্ঞা, অপমান কবিতার ওপর হোক না কেন। শুধু কবিতার কথা কেন, কবিদের ওপরও পাঠককে বিযুক্ত করা যাবে না। যেমন যায়নি প্রণবেন্দুর কবিতা থেকে বাংলা কবিতার সিরিয়াস পাঠককে বিযুক্ত করতে।

' ... হঠাৎ পড়ল মনে / আনাকে ডাকেনি আজ বাটানগরের কবিসভা'

[ব্যর্থ কবি □ অংশ □ হাওয়া স্পর্শ করো]

ভিতরে খান খান হয়ে যাওয়ার পরও অনেক সময় মানুষ হয়তো বাইরে অটল থাকে। কিন্তু কবি হয়তো কাব্যে তা প্রকাশ করেন। তার একটি কাব্যের সঙ্গে অপরটির হয়তো কোনো মিল নেই। কিন্তু এদের সকলকে নিয়ে তৈরি হয় একটি

ভ্রমণ পথ বা কাব্যপথ। যে পথে কবি গেছেন। আমরাও গেছি। আর এই যে বিচিত্র লক্ষ, ভিন্ন ভিন্ন দিক হতে ভবিতব্যতার দিকে ছুটে যাওয়ার প্রবণতা মানুষের তো চিরকালের। কিন্তু তার থেকেও বড়ো কথা হল, তার কবিতার কাছে আমাদের ঋণ স্বীকারের দায় কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। জীবনের কঠিন বাঁকে এল প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা– আমাদের প্রাণিত করেছে, সাহস জুগিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে, যে কথা পাঠক মাত্রেই জানেন। অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তার কাছে প্রেরণা পেয়েই বোধহয় সত্তরের দশকে কবিকণ্ঠ ঘোষণা করতে পেরেছে সেই অমোঘ পঙ্‌ক্তি 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'।,

যদিও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুবাদে গোটা পৃথিবী এখন ঘরের মধ্যে এসে গিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এই মুহূর্তে ঠিক কী ঘটে চলেছে, অজস্র চ্যানেলে কোনো না কোনোটাতে তা আমাদের চোখের সামনে চলে আসছে। এখন আর রিপোর্টিং বা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়ে যুদ্ধের খবরাখবর জানার দরকার হয় না। নিপীড়ন, প্রতিরোধ, অত্যাচার, অভ্যুত্থান, জঙ্গিহানা, বর্ণবৈষম্য, প্রকৃতি বিপর্যয় এখন জলভাত। এই অবস্থায় বিশেষত কবিতার কাছে যাওয়া। কবির কাছে যেতে হয়। প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতাতে আছে সেই মৃত সঞ্জীবনী।

... দ্যাখো মানুষের দুঃখ, দ্যাখো তার সুখ, দ্যাখো খেলা - / কীভাবে টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়ে / সে নিজেকে আস্তভাবে রেখে দেয় সকলের কাছে -/ পুজো আর্চা সেরে নিয়ে, শ্যালিকার সঙ্গে কিছু খুনসুটি করে, / তারপর লন্ড্রি থেকে জামা নিয়ে আসে।'

[মানব জমিন □ অংশ □ মানুষের দিকে]

অডেন একসময় বলেছিলেন, কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, শুধু মাত্র কবিতাই। সামাজিক কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক নয়। বলেছিলেন, কবিতা কিছুই ঘটায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতার জগৎ থেকে এটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন। নিজের জোরেই কবিতা বেঁচে থাকে। 'নিজের জোরে' এই শব্দবন্ধে কবিও ঢুকে পড়েন। তাই প্রণবেন্দুর কবিতা শুধু ক্ষণে ক্ষণে পড়তে পড়তে আবিষ্কৃত-ই হয় না, পুনরাবিষ্কৃত হয়। ডেভিড হাভেন ব্লেক তাঁর একটি সাম্প্রতিক নিবন্ধে লিখেছেন, হুইটম্যান যদি একশো বছর আগে জন্মগ্রহণ না করে ১৯৬০ বা ১৯৭০ এর দশকে জন্মাতেন তাহলে তাঁকে আমরা নির্ঘাত রক স্টার বা লোক গীতিকারের ভূমিকায় দেখতে পেতাম। কিন্তু আসলে কথা একটাই। আরাধনশীল হওয়া। কম্পিউটার সভ্যতাতো এগিয়ে এসেছে,

এসেছে টেলিভিশন সভ্যতা এমনকি পারমাণবিক সভ্যতা কিন্তু কবিতা লেখা কি বন্ধ হয়েছে না কি কবিতা পড়ে না মানুষ ! প্রেমের মতোই। একদিন ছিল আজ হয়তো তার অস্তিত্বই নেই তা বলে কি প্রেমে পরবে না মানুষ !

'... এক আগুন থেকে আর-এক আগুন / এমনকি দূর ! / চলো, আমরা আরও একটু পুড়ি / ... / বেঁচে থাকতে হলে, কিন্তু দগ্ধ হয়ে / বেঁচে থাকতে হবে। / নইলে সবাই বলবে : জোচ্চুরি।'

[আগুন থেকে আগুন □ অংশ □ অন্ধপ্রাণ, জাগো]

সাধারণত রোমান্টিকতা কবিদের সহজাত অধিকার। যেমন নারীর প্রতি ভালোবাসা, তেমনি সার্বিক ভালোবাসার অতৃপ্তি, মৃত্যুচেতনা কবিতাকে সামনে রেখে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের প্রবণতা - সবই রোমান্টিকতার ধর্ম। পঞ্চাশ দশকের কবিদের ক্ষেত্রে এই নাগরিক রোমান্টিকতার প্রশ্রয় বেশিমাত্রায় লক্ষ করা যায়। আসলে বাংলা কবিতার জগতে সেই সময় সাধারণভাবেই এক অনিয়ন্ত্রিত মানসিকতার প্রাক্কালে আচ্ছন্ন ছিল বাঙালি হৃদয়। কিন্তু প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত এর ব্যতিক্রম। তার রোমান্টিকতা অস্তিত্বে সংকটকে স্বীকার করেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একাকিত্বের সামনে এসে দাঁড়াতে তার কবিতা কখনও ভয় পায়নি। তারই কথায় : '... ভাঙা ঘরে, মস্ত একটা হাওয়ায়, / মানুষ কাঁপছে, / একটা হাত পাশের মানুষীকে / ধরে আছে; / আর-একটা হাত / কোথায় রাখবে — বুঝতে পারছে না?'

[মানুষ ১৯৬১ □ অংশ □ সদর স্ট্রিটের বারান্দা]

আসলে যা আমাদের আটপৌরে শব্দ যাকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছেন, 'living language of men' তাতেই লিখে গেছেন প্রণবেন্দু আজীবন। কোনো শব্দই অপাঙ্‌ক্তেয় বা ব্রাত্য নয় তার কাছে। পথচলতি কথ্য ভাষার পাশাপাশি অভিজাত তৎসম শব্দকেও কবিতায় সমান তাৎপর্য দিয়েছেন। কোনো শব্দই তার কবিতায় অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেনি কখনও। মাথা তুলে ঘোষণা করেছে এটাই তার আসল জায়গা।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একবার বলেছিলেন কবিতার কাছে আমার মূল তিনটে

চাহিদা আছে। এই তিনটি চাহিদা যিনি মেটাতে পারেন তিনি আমার কাছে একজন জরুরি কবি।

এক, তিনি আমার আনন্দে সমর্থন দেন কিনা; দুই, তিনি আমার শোকে সান্ত্বনা দেন কিনা আর তিন, যখন আমি ভগ্নহৃদয় অবস্থায় লড়াইটাকে ছেড়ে দিচ্ছি, তখন তাঁর কবিতা আমায় সাহস জোগায় কিনা।

একথা স্বীকার করতে আমাদের লজ্জা নেই যে কবি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের কবিতা সম্পর্কে এই তিনটি শর্ত-ই খাটে। তিরিশের তিন বিখ্যাত কবি অডেন, স্পেন্ডার এবং লুইস। এরা তিনজনই কবিতার পাশাপাশি কবিতা বিষয়ক গদ্য লিখতেন। প্রণবেন্দুর ক্ষেত্রেও তাই দেখি। একটা 'poetic image' লক্ষ্য করা যায় তার গদ্যে। তাঁর প্রবন্ধ যখন পাঠক আত্মস্থ করে তখন ছোটো ছোটো ভাবনা থেকে মুক্তির আস্বাদ পায়। তাছাড়া 'অলিন্দ' বলে যে কবিতা পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করতেন তাতে যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল কবি হিসেবে তারা পরবর্তীকালে বিখ্যাত হন। শুধু তাই না শঙ্খ ঘোষ ১৯৯৩ সালে 'অলিন্দে' লিখেছিলেন 'ন্যায় অন্যায় জানিনে' নামে সেই বিখ্যাত কবিতাটি। নগ্ন, হিংস্র এবং রক্ত নিক্ষিপ্ত এই কবিতাটির উৎস ছিল সমাজের একটা অংশকে দেখানো। ক্ষমতার অপব্যবহার। পুলিশের গুলিতে সাধারণের মৃত্যু। শুরু হচ্ছে কবিতাটি এইভাবে 'তিন রাউন্ড গুলি খেলে তেইশজন মরে যায় লোকে এত বজ্জাত হয়েছে / ... / আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছুই জানে না বুলেটেরা/দার্শনিক চোখ শুধু আকাশের তারা দ্যাখে বটে মাঝে মাঝে/# / পুলিশ কখনও কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমায় পুলিশ' উপরোক্ত উদ্ধৃতিটি দেওয়ার উদ্দেশ্য সম্পাদক হিসেবেও প্রণবেন্দু কতটা সমাজ সচেতন ছিলেন। আমরা অনেক সময় social commitment বলে চেঁচাতে থাকি কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করে বসি। প্রণবেন্দুর লেখায় এবং তার কর্মে তা ছিল না কখনও।

' ... পরাগের ভাই, আর তার দাদা, মানে সম্পূর্ণ পরাগ, / আর পরাগের বউ, আর যত - বন্ধু ও স্বজন / সবাই নিন্দে করে বলে / আমি ঝাউবন ধরে হেঁটে গিয়ে / সমুদ্রের দিকে চলে যাই'

[পরাগের ভাই □ অংশ □ নিঃশব্দ শিকড়]

প্রত্যেক সৃষ্টিশীল কবির কাজের একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। যাকে বলে

ক্যারেক্টারস্টিকস্। এই ক্যারেক্টারস্টিকস না থাকলে তার কাজকে, কবিতাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না।

এই সৃষ্টির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য প্রণবেন্দুর লেখায় আমরা সবসময় পেয়েছি। তার কবিতায় কখনও ধুলো জমেনি। এবং অপরের কবিতা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সবসময় সজাগ এবং শ্রদ্ধাশীল। কুয়াশার মতো কিছু এসে তার কবিতার মুখ ঢেকে দেয়নি কখনও। তিনি লড়াই করেছেন সবসময় নিজের সঙ্গে। নিজের ভাষার সঙ্গে। আর তাতেই গতিময় হয়েছে তার কথোপকথন। অন্ধ কোনো বোধকে আঁকড়ে থাকা নয়। সচেতনে, একটি প্রান্তিকতার বয়ান তৈরি করা। আর সেই সঙ্গে যারা কবিতা পাঠক তারা বুঝতে পারেন প্রণবেন্দুর কবিতায় কি জাদু লুকিয়ে আছে কী-সেই আনন্দ। উত্তেজনা।

তার 'রৌদ্রের নখরে' বইটির সূত্র ধরে নতুন করে পড়তে হল তার নির্বাচিত কবিতা। শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং সমস্ত গদ্য পদ্য লেখা ও চোদ্দোটি কবিতার বই। সেই অভিজ্ঞতার কথাই সিন্ধুতে বিন্দু হিসেবে বললাম। যদিও এ লেখা সম্পূর্ণ নয়। বিচার বিশ্লেষণ তো নয়ই কেননা কবিতার কোনো বিশ্লেষণ হয় না। যা হয় তা শুধু আত্মীকরণ। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া কবিতা অভিজ্ঞতা, সর্বস্বকে ব্যাপ্ত করা। এই মাত্র।

কোনো বিশেষ মিথ বা পুরাণের অনুস্মরণ নেই তার কবিতায়। বদলে আছে ক্রমাগত জীবনসন্ধা, সমাজ বোধ এবং ধ্যানী প্রত্যক্ষণ এবং আশ্চর্যভাবে এই সত্যের কাছে নত হয়ে ক্রমশই তার কবিতা থেকে সরে যায় জটিল শব্দ বিন্যাস। অথচ অনুপম ভাবনাগুলি মুখ ধুয়ে নেয় সাগ্নিক আলোয়। এই প্রত্যাসিদ্ধ সত্যের উন্মোচন পাঠকের মানসচক্ষে এক সম্মোহন সৃষ্টি করে অনায়াসে। এক শিহরন, এক বোধাতীত পূর্ণতা, এক অতলান্ত দর্শন। শিল্পী স্বভাবের নির্ভরতার পাশাপাশি বাগ বৈভবের সুভদ্র উপস্থাপনায় তিনি তার সময়কে ছাড়িয়ে যেতে পারেন সহজেই এবং হয়ে ওঠেন অনন্য।

এই অনন্য সাধারণ কবির পায়ের কাছে নামানো থাক আমাদের উষ্ণীষ।